সমুদ্র দুভাবে ডাকে

বিদ্যুৎ পাল

সমুদ্র দুভাবে ডাকে

বিদ্যুৎ পাল

পরিবেশক
কলাচিহ্ন
লিঙ্কসেন্টার
২৬/১এ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

SAMUDRA DUBHABE DAKE

a book of poems by

BIDYUT PAL

Price Rs 25/-

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৯৮

প্রকাশক

দীপন মিত্র

১৯/২এ কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন লেন

বরানগর, কলকাতা ৭০০ ০৩৬

মুদ্রণ

সত্যযুগ কর্মী শিল্প সমবায় প্রেস

১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭২

প্রচ্ছদ

কমল আইচ

দাম ☐ পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম হিন্দী কবি
আলোকধনোয়া-কে

পূর্ব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

আজকের দিনটার জন্য

সূচীপত্র

ন্ত ৯ ● প্রথম এজেন্ডা ১১ ● মেয়েটি ১২ ● গুলি ১৩ ● সূচী ১৪ ● সুকান্তকে ১৫
৭ ● শরৎ ১৮ ● শুশুক ১৯ ● সম্মেলন ২০ ● একুশ ২১ ● নিঝ্নিনভ্গরোদ ২২
লা ২৩ ● আবার আরেকটিবার ২৪ ● একটি গানের সাথে পরিচয় ২৫ ● শহর ২৭
২৮ ● ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩১ ● ছুট ৩২ ● মাল্লা ৩৩ ● ঠেলায় চড়ানো বাগান ৩৪
লি উপাধ্যায় ৩৫ ● সার্জিকালে রাতজাগা ৩৬ ● সুপ্রভাত, দেশ ৩৭ ● মা ও ছেলে ৩৮
৩৯ ● এ বাঁধন ৪০ ● চিঠি লেখা ৪১ ● কাল সকালে ৪২ ● শিশুরা স্কুল থেকে ফেরার পথে
৩ ● গীটার শিক্ষককে ৪৪ ● জুন-দুপুরের ম্যান্ডোলিন ৪৫ ● গেয়ে চলুন গিরিজাদেবী ৪৭
ড়ব? ৪৮ ● এই তো ৪৯ ● নাম পৃথিবী ৫০ ● বিহার ৫১ ● রাত্রে ভাতের দোকান ৫২
৩

সমুদ্র দুভাবে ডাকে

বাসস্ট্যান্ড

মাথার ওপর
ঘষা নীলচে ধূসর সেই চর।
নিচে চারপাশে
শহরটার ঘরে ফেরার জোনাকি।
নদীটা ঠিক কোনদিকে কে জানে!

সকালে এসেছিলাম,
এখন এই সন্ধ্যায় ফিরে যাব।
রাতে?
না ভাই, থাকতে পারব না।

কয়েকজন যাত্রী একের পর এক
কয়েকটি শহরের নাম বলে জানতে চাইল
সামনের বাসগুলো যাবে কিনা
সেসব শহরে
কয়েকজন খালাসী চিৎকার করে জানাল
আরো কয়েকটি শহর, বসতের নাম...
কত জায়গায় একসাথে সকালে পৌঁছব?
জানি
সারারাত ভারতবর্ষই পথ হবে, তবু
না ভাই, সম্ভব নয়।

পরের বার দেখা যাবে।
পৃথিবী?
তারও পরের বার
দেখা যাবে।

চিনতে ভুল হবে না একটুও

এই বাসস্ট্যান্ড, ডাক
সিঁদুর ঘষা নীলচে ধূসর চর মাথার ওপর
নিচে চারপাশে শহরের ঘরে ফেরার জোনাকি...
নদীও, ঠিক কোনদিকে
খুঁজে বার করব সেবার

আপাতত
নিজের বাসটা চিনে উঠি,
জানালার কাঁচ সরাই।
বাইরে
তিনটে লোকসভা ক্ষেত্রের অন্তরাল
পেরিয়ে আমার
সংগঠন দপ্তরের টেবিলটা জেগে ওঠে—
চেয়ারে,
টুলে,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাথীরা,
সামনে প্রিয় নেতা আমাদের সবাইকার,
টাইপরাইটার,
ব্যানারের ডান্ডা,
প্ল্যাকার্ড, পোস্টার,
আর আগামী প্রোগ্রামের
নোটিশ বোর্ড।

প্রথম এজেন্ডা

পাথরটা একটু সরিয়েছি।
আরো অনেকখানি
সরাতে হবে; সবাই
বুঝছি তো
যে এটা পাথরের ভার?...

ভেরিনিয়াকে আবার দাসী হতে হবে, নইলে
কি করে ফিরবে স্পার্টাকাস?

কবি বলেছিলেন
'এই দাগ ধরা উজালা, রাতের ছোপ লাগা সকাল
যার প্রতীক্ষা ছিল, সে সকাল তো এ নয়।'
তবু বাঁচছি।

জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে
ভূমিকম্পেও।
দুটো কথা বলার,
সিদ্ধান্ত নেওয়ার,
প্রয়োজনে
পিঠোপিঠি দাঁড়িয়ে।

পতাকাটা উড়তে দিতে হবে
আকাশ ছিনিয়ে নিলে ওরা
পাঁজরের আড়ালে।

প্রথম এজেন্ডা ঃ
সংগঠন।

মেয়েটি

(পরবলপুর, নালন্দা ঃ ২২.৫.৯২)

অশথের তলায়
বালখিল্য ছায়ারা কাঁপবে নতুন নতুনতর পাতার।
মাইকে বাজবে কুৎসিততর গান।
পিছনে তেলকলে
ধুতি গুটিয়ে বসবে মালিকপুঙ্গব
বাপের দ্বিগুণ হারামী।
বাদুড়ঝোলা বাসটা এসে দাঁড়ালে
স্টলে, সোডার বোতলের সাথে
ঠুনঠুন করে বাজবে মহানগরের বেলেল্লা ইশারা।

অশথের তলায়
নোংরা স্কুলড্রেস পরে দুলে দুলে
শশা চিবোতে থাকা মেয়েটি
ডানপিটে নেত্রী হবে নিজের খেলার
সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের।
ইস্কুলের মাঠে তার ভাষণের খবর ছড়াবে দ্রুত...
বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হবে।

নালন্দার চত্বরে সেদিন অনেক ভীড়।
স্মৃতি জেগে ওঠায় সচকিত জেলার কৃষক, কারিগর।
কানে কানে ছড়াবে খবর,
এক্ষুনি,
এক্ষুনি আসছে মেয়েটি
বুদ্ধের হাত ধরে।

গুলি

অনেক ধরনের সন্ধ্যা নদীতীরের
মিছিলভাঙা ইতস্তত ভীড়ে খেলছিল।
অনেক ধরনের মানুষ
তার মৃত শরীররটাকে পোড়াতে এসেছিল;
সে নিজেও
অনেক ধরনের
মানুষ ছিল তার দৈনন্দিনে, যেমন
হয়ে থাকি
আমরা সবাই
কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার
গণতান্ত্রিক বোঝাপড়ায়।

অনেক ধরনের ভাঙন ও একীকরণের মাঝে পথ করে
পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক তিনটে গুলি;
আমরা
ওই লোচ্চা সি.ও.টাকে কোনোদিন চোরাগোপ্তা মারার
রাজনৈতিক লাভক্ষতি নিয়ে কথা বলছিলাম।

মৃত জেলাসচিবের সম্মানে
পার্টি-পতাকা ছিল অর্দ্ধনমিত।
অনেক ধরনের সন্ধ্যা নদীতীরের
মিছিলভাঙা ইতস্তত ভীড়ে খেলছিল।

সূচী

এই হত্যাগুলোর প্রতিশোধ
এখনই সম্ভব নয়।
তবু
সূচী যেন সম্পূর্ণ হয়।

'ইত্যাদি' শব্দটা
ভালো লাগে না স্মৃতিতে।
মানুষ ভুলে যায়।
মানুষ সত্যিই ভুলে যায়।
এই সূচী
ফিরিয়ে আনবে স্মরণ।
জাগিয়ে রাখবে স্মরণ।

মাথাটা খোঁজো
শনাক্ত করো শরীর।
নথীভুক্ত করো বয়ান।

সূচী যেন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।
সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

সুকান্তকে

মায়াকভস্কি,
ভাপসারভ,
তুমি!
কব্জি বলশেভিক,
দেয়ালে শাবল,
কবিতায় সংগঠন।

তোমার ওই মহানগর—
কলকাতা
যার একটি মানুষের হাত, কবি
নাজিম
নক্ষত্র ঠেলে সরিয়ে চেয়েছিলেন
যার পথযুদ্ধে কিংবদন্তী কিশোর
পড়ার কেরোসিন চেয়ে
বুক চিতিয়ে সার্জেন্টের
রিভলবারটা নস্যাৎ করেছিল
এবং
যার গোপন পল্লব আজো শ্রেণীঘৃণায়
সতেজ।

যেতে পড়ে জসিডি।
এই শ্রাবণে
ট্রেনে, প্ল্যাটফর্মে, বাসে
গিজগিজ করে ঈশ্বরের ভীড়।
ভীড় বাড়ে প্রতিবছর
দুই গোলার্ধের
মানুষের লাঞ্ছনার সবকটি পীঠস্থানে
আর ঈশ্বরেরা টের পায়
তাদের মৃত্যুভয়।
....
....

সীতারামপুরের
লাইনসংযোগের খটরমটরে ছেলেটা
কামরায় উঠে আসে।
এদিকে ধানবাদ, চন্দ্রপুরা, বোকারো
ওদিকে
টাটা, রাউরকেল্লা, সামনে দুর্গাপুর...

আর বড় আন্দোলনগুলির
　　　কাজ জারি রেখেও ভাবতে হয়
বন্ধ কলকারখানার
সমস্যাটা দাড়ি নয় দু'দশ দিনের;

টিকিটের কোণা দিয়ে সে গলার ঘামাচি
চুলকায়।
একটা সিগারেটে জিরিয়ে
হ্যান্ডবিল বিলি করতে শুরু করে।
....
....
উনিশ শো নব্বই— চুরানব্বই।
আমরা প্রহসনে ট্র্যাজেডী বাঁচতে শিখছি।
তবু বলা যায় চার বছরে দুনিয়ার
বিশ্বাসযোগ্যতা
বেড়েছে বই কমেনি
....
....
চৌষট্টিতে কোনদিকে যেতে সুকান্ত?
আর সাতষট্টিতে?
....
....
আমি পাটনার মানুষ।
তাও তো ইদানিং
বেশ কটি অজুহাত পাই
　　　　　হুগলির দুপুরে বসবার,
বেশ কটি তর্কাতর্কি—
　　　সরকারে বামফ্রন্ট থাকার মদত
　　　　　　　কোথায় কতটুকু
　　　　　পাওয়া না পাওয়ার
আর ভালো লাগে যখন
দিল্লীতে
লালকিলার পিছনে আমরা নিজেদের
　　　　　　　মানে বিহারের
ক্যাম্পে গিয়ে ঢুকি
ব্যাগ থেকে ডাইরি হাতড়িয়ে
বাংলার ক্যাম্পে গিয়ে খবর পাই
তুমি কোথাও বেরিয়েছ।

পরের দিন
কাঁধে পতাকা ওঠানো;
ভারতবর্ষের বর্তমান
　　　　　তোমার চিরকাল।

ফেরা

যেন এক অন্তর্গত অসময়।
অতীত ইস্কুলের
ভরা সব ক্লাস, জ্বলছে বাতিও।
তাহলে ফিরে এলাম?

সাইকেল, ভাঙা গ্যারাজের সামনে রাখি।
ঝুঁকে
তালা লাগাই।
পিছনে কারো মুখের আভাস—

আমবাগান, দূরত্ব, রানওয়ে ও ফাঁকি
স্পষ্ট বোঝা যায় আজ কোথায়
কোনটা শুরু, কোথায় শেষ।
বেশ ক'টি প্রজন্ম আমাদের পরে এসে
ধুলোর ঘূর্ণির দিকে এগিয়েছে।

—ফিরে এলি?
—হ্যাঁ, দেরী হল অনেক।
—কি পড়বি?
—সব পড়া।
আবার পড়ব, সব খেলা খেলব আবার।
আর বলব কিছু কথা
প্রার্থনা ভণ্ডুল করে সকালের...
যা তখন বলতে পারিনি।
....

বেত খাব। রাস্টিকেট হব।
নতুন করে ধুলোর ঘূর্ণিটার দিকে এগোব।

শরৎ

শিশুরা রাতের ছোটো খেলাগুলো খেলছে।
পথটা উঠোন, জ্যোৎস্নায় অনাবিল
ল্যাম্পপোস্ট ঘিরে দশ দুয়োরের মিল
আকাশটা এত নীল—
গাভিন মৌন স্মৃতির ঝাপটে দুলছে।

ভারী চালে কিছু নতুন শিশুরা মিশল।
সারাদিনভর রোজগারে পয়মাল
রক্তে পাল্টি ঢেউ করে বেখেয়াল,
বয়সটা বড় জাল—
উবু দুই তিনে চিতিয়ে দু'হাত পাতল।

শুশুক

ভালোবাসি নিজবয়সী নারীটির মুখ—
সম্বৃত অন্তরাগের নিগূঢ় নির্বেদ...
নাগরিক সাহচর্যে, মৌনে, মিতভাষে
ঘাই দেয় সান্ধ্য জলে কালের শুশুক।

পিঠোপিঠি সখা! কোন বসতের রোদে
ভরেছিল তোর শঙ্খে সাগরের ঘাম?
কোন রোয়াকে তোর ভেজা মুঠোর রুমাল
কবুল করত দশ প্রেমিকের জান?

তোর বা আমার থেকে অনেক বেবাক্
যৌবনের স্পর্ধী ভীড়ে, ঈষৎ প্রবীণ
নিজেদের ঠা'র করি— সমসাময়িক
হওয়ার সঙ্গীতে ফেরে শহরের ঋণ।

খড়কুটোয় দিনজোড়া শান্তি-অশান্তির...
ভালোবাসি মুখ নিজবয়সী নারীটির।

সম্মেলন

ভীড়ে ভরা ক্যাম্পে বেলা দশটায় শুয়ে
তন্দ্রা আসে, দুই রাতে সাজিয়ে শহর—

ফুলদির বাসি বিয়ে, পরীক্ষা শেষের
উঠোন ছাপিয়ে জাগে স্মারক-নগর।
শিকড়ে অলীক রোদে মধু গাঢ় হয়;
স্বজনের মুখ দেখি বিচিত্র প্রসারে...
গুরুজন, সমবয়সী, জীবিত ও মৃত
ব্যস্ত! তবু কোন কাজে? এ কোন সময়?

আমাদের শৈশবটি তোরণের কাছে
সয় চিরকাল বহু পার্বণের ব্যথা
রাজনীতি, রূপকথার মাঝে খেলাচ্ছলে
বাতাসী-ঘুম বুড়িরা বুকে মোছে চোখ।

ঘুম চোখে ঘূর্ণী ওঠে মার্চের হাওয়ার,
কানে শুনি ডাক, 'সাথী ভলান্টিয়ার্স!'

একুশ

নিজেকে সমন করে দায়বদ্ধ রাতে
ফেব্রুয়ারী-সংখ্যা-শীর্ষে একুশ সাজাই
পত্রিকায় ভরে দিই বাংলার গৌরব;
আমরা ভালোই ঢুকে জাতির আড়তে
টেক্কা দিয়ে বিজাতীয় হওয়ার তাকতে
পেশা দক্ষ যোজনায় সারছি উৎসব।

শুধু কি বাংলার ক্ষত, বুকের কার্তুজে?
এ উপমহাদ্বীপের। ভাষার শহীদ!
দেখ এ ভূমির যত শিল্পজ কুসীদ
মাটি খুঁজছে সত্ত্বার, ধর্মগত কুঁজে।

বাংলা কি উর্দুর নয়? তাহলে গালিব?
'হিন্দ' এক আত্মীয়তা-প্রসঙ্গ সজীব!
সুচেতনা নয় দূর দ্বীপ দু'বাংলার,
ঐ পথে ক্রমমুক্তি জাতির, ভাষার।

নিঝ্নিনভ্গরোদ

আকাশ সেই দুপুর থেকে কালো।
ভর বিকেলের এক আঁজলা
হলুদ আভায় সারা শহর
অনেক জীবন বাঁচার মত ভালো।

ঝড়ের গোলাপ ফুটবে কি আজ সাঁঝে?
কিশোরকালের সাথীনটিকে
দু'হাত মেলে গান পাঠাবো
ফিরে আসার—
উধাও পথের মাঝে।

বলব তাকে বাঁচার কর্জ শোধে
আমি রইলাম এইখানে আর
বন্ধুরা ভিনশহরে যেমন
গর্কি ছিলেন নিঝ্নিনভ্গরোদে!

গর্কি কোথায় আমরা কোথায়, তবু
বর্ষায় হয়ে টইটুম্বর
ফাল্গুনে টালমাটাল, রাতের
তারাদের আঁচ ঢাকতে খাটাই তাঁবু।

তারাগুলি বড় ক্লিষ্ট।
আমাদেরই গড়া
খড়কুটো, অদৃষ্ট।

টিটওয়ালা

দাদরে টিকিট কাটার আগে
আমরা কাউন্টারের
ওপরে তাকিয়ে পড়েছিলাম
সায়ন লাইনে
লোকালে
শেষ স্টেশনটার নাম।...
দুপুর নাগাদ
পৌঁছেছিল ট্রেন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে
দু'চার ঘর দোকান, চারা মেশিন তারপর
মাঠ, ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে মেঠো রাস্তা চলে গেছে বহুদূর—
কোনো গ্রাম?
নাকি দূরের ঐ পাহাড় অব্দি
যার ওপর একটা মন্দিরও আছে মনে হয়?

বেশ কয়েকজন
যাত্রী
নেমে ওদিকে পাড়ি দিল।
আমরাও দেখাদেখি
কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলাম।
একটা দোকানে বসে আখের রস খেলাম।
ফেরৎ
প্ল্যাটফর্মে এসে ট্রেনের জন্য দাঁড়ালাম
যেন স্থানীয় বাসিন্দা, যাচ্ছি দাদর কিম্বা চার্চগেট।

টিটওয়ালা। ডিসেম্বরের দুপুর।...
ওটা পৃথিবীর শেষ স্টেশন ছিল না।
এদেশেরও না।
আমাদের যাত্রারও না।
আমাদের নিরুদ্দেশ হওয়া ও ঘরে ফেরার
মাঝামাঝি রয়েছে টিটওয়ালা।

আবার আরেকটিবার

মধ্যরাতে ট্রেন থেকে নেমে।
সেই ছোট্ট নির্জন প্রায়ান্ধকার স্টেশনে
গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এ স্টেশনটার কোনো নাম নেই।
এ স্টেশনে কোনো দূরপাল্লার ট্রেনের দাঁড়ানোর কথা নয়
অথচ সব ট্রেন
ঠিক দাঁড়িয়ে পড়ে।
সব ট্রেনের মধ্যরাতেই
এই স্টেশনটা আবির্ভূত হয়।
এই স্টেশনের স্টেশনমাস্টার, রেলপথের জন্মকাল থেকে
এক বেদনাঘন
অলিখিত উপন্যাসের
স্মিতভাষ নায়ক।
তার আগে
তিনি ঘোড়াবদলকারী ছিলেন
সরাইয়ের যাত্রীদের।

এই স্টেশনেরই স্বল্পালোকে
তার আসবার কথা থাকে—

কার? প্রেম না মৃত্যুর?...

একদিন সিগারেট ধরাতাম
তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে, কিন্তু আজ
আমি সযত্নে পরিহার করি চাওয়া,
সিগারেট ধরানো, সংশয়—
প্রেম না মৃত্যু!
আমি নিজেকে জেরা করি
সাদাপোষাকে টিকটিকির মত,
'কোনো কাজ আছে এখানে আপনার? তাহলে?'...

ট্রেনের ভিতরে আমাদের ছোট্ট ছেলেটা;
সিঁড়ি বেয়ে উঠে
আমি চাইলাম
তার যৌবনে যেন আর
মৃত্যুর সংশয় না থাকে কোনো প্রেমের মুখে,

কোনো নামহীন স্টেশন যেন না থাকে।

একটি গানের সাথে পরিচয়

'আমি চঞ্চল'
শোনালেন দেবব্রত, তাই বলি
দেবব্রতেরই গান।

তোমার আবহ থেকে অনেক দূরে কবি
সারাদিন এক বন্ধ হলঘরে গোলামীতে কাটত।
নিজের, পরিবারের, পার্টির কর্মী এবং
নবজাত পত্রিকার রসদ জোটাতাম।
সিগারেট কিনতে বেরিয়ে
সেদিন আকাশের দিকে গুনগুনিয়ে উঠলাম
'আমি চঞ্চল'...আর মহাবিশ্বের কোনো অঞ্চল থেকে, সবুজ
পৃথিবীকে দেখতে পেলাম— ধ্বংস ও স্বপ্ন নিয়ে ঘুরছে।
রাতে,
চোখ থেকে ঘুম তাড়াতে মাথার চুলগুলো খামচে ধরতাম।
সামনে সদ্য শুরু করা 'ক্যাপিটাল'— ইতিহাসের বীজগণিত...
সেদিন মাথা ভার হয়ে আসতে গুনগুনিয়ে উঠলাম
'আমি চঞ্চল'...।

আমি দেবব্রত নই। গানটা শোনার পর
অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চাইলাম
ফুসফুস নিংড়ে পৌঁছোতে 'ব্যাকুল বাঁশরী'তে
অথবা তরুমূলে রসের মত
সঞ্চারিত হতে চাইলাম 'আমি উন্মনা'য়—
কি করে হয়
যে আমার ফিরে পাওয়া গান আমি গাইব না?

ভীড়ে ভরা বাড়ি—

অবসরে শহরের বাইরে চলে গেলাম
সাইকেলটা উঠিয়ে
নির্জন হাইওয়ে বা কোনো টিলার পিছনে।...
(যেদিন পুরো গানটা গাইতে পারলাম, ওঃ আমার মনে আছে
অরণ্যের মত দুলে উঠলাম একটিবার।)

মাঝে মাঝে ঘিরে ধরত ওরা।
পুরোনো নরকের বিষন্ন সঙ্গীরা, হিতাকাঙ্ক্ষী জ্যাঠাদের দল।
সেদিন আমি কলার চেপে ধরে হিস্‌হিসিয়ে উঠলাম
'ফেরাবি শালা পঁচিশটা বছর?
সাথে চল্‌, নয়ত জাহান্নমে যা! তবে ইত্‌মিনানে থাক্‌,
ফিরে আসব!'...

ডাইরির পাতায় লেখা আছে—
......ধন্যবাদ কবি ও গায়ক!
কোনোদিন এক মহাকাশযানের গায়ে এঁকে দেব
'আমি চঞ্চল, আমি সুদূরের পিয়াসী'...।

শহর

একদিন আসে দুর্যোগ কাটিয়ে-ওঠা সকাল;
দেবদারুপল্লব আর হাওয়া
শহরের সবকটি ভিজে পথ প্রাচীন লোকগীতির বাঁকে হারিয়ে
সৌরখচিত সমুদ্রের দিকে খুলে যায়।
রাতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে পারা যত মানুষ, সেদিন
দলকে দল সমুদ্রের দিকে যায়, আর আমি
তাদের চলে যাওয়ার প্রতীক্ষা করি।

সমুদ্রতীরে ঢেউ-এর ওপর
অসংখ্য ধবল জাহাজ জন্ম নেয় সেইদিন।
সবাই সে জাহাজগুলোতে চড়ে।
সুদূর গভীরে এক উজ্জ্বল রেখার রহস্যে
পুরো শহরের মানুষ সেদিন উৎসব করতে চলে যায়।
আমি তাদের বিদায় জানিয়ে ফিরে আসি।

আমি ও শহর সেদিন, সারাদিন
হাতে হাত ধরে জনশূন্য রাস্তায়, প্ল্যাটফর্মে, ব্রীজের ওপর
শূন্য রেস্তরাঁয়, ছাতের কার্নিশে ঘুরে বেড়াই।
কখনো চুপচাপ, পার্কে বসে থাকি।
একে অন্যের কাঁধে মাথা রেখে, পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে,
কখনো একে অন্যের মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে পড়ি।

কথা বলি সারাদিন।
অনেক, অনেক কথায়
কত ধুলোর স্তর, কত বছর পার হয়ে যায়।

জলাধার

জলাধার!
ভিতরে স্বচ্ছ টঙ্কার, তরল পৃথিবীর।
নিচে মেশিনের গুঞ্জরণে
লুপ্ত টেথিসের নিয়ন্ত্রিত আলোড়ন।

ওই স্তম্ভ আমার হাত ছিল।
সিমেন্টের ওই পাত্র— করতল, অসহায়
ঊষর মরুর ঝলসান আকাশের দিকে উঠেছিল।
অনেক নদীতীরে,
অনেক চাঁদের বছরের
একই শক্তি ও শৃঙ্খলে
আঁকা হয়েছিল প্রথম
অভিনিষ্ক্রমণ।

জলাধার!
পাখি ও হাওয়ার পথে জলের শহুরে ঘর।
ঘরে জলের পদশব্দ— প্রাচীন, উচ্ছল!

জল!
একদিন তোমারই সন্ধ্যায় জনপদ গড়তে ডেকে তারপর
বজ্রদীর্ণ রাতে
কুল ছাপিয়ে গর্জন করে এসে
ভেঙেছিলে উনুন,
মাটির পাত্রে আঁকা আমাদের পাতার গুচ্ছ আর তারা।...
আমরা ভয় পেয়েছিলাম।
মা তো প্রেয়সীও!
তবু নবজাত আমরা সেই রাতে
নগ্ন, বন্য অভিসারে দেখে তোমায়
ভয় পেয়েছিলাম—
বাঁধ দিতে শিখিনি তখনো
দিতে পারিনি ব্যারাজ, টার্বাইন।
ভাঙা বসত আর মৃত হাড়ে কিছুটা পলিস্তরে ডুবে তাই আবার

ছড়িয়ে পড়েছিলাম...।

কতবার রঙ আর গঠন বদলাল মাটির;
নতুন ফল, নতুন ধাতু আর নতুন যুগের দিকে তবু
তোমারই নাম ধরে এগিয়েছি—
ইউফ্রেটিস, সিন্ধু, নীল, দানিয়ুব, ইয়াংসি, আমাজন...
আর আজ গঙ্গার পাড়ে এক মেঘলা সকালে
এই জলাধারের সামনে আমি দাঁড়িয়ে—
জল!
তারল্য, প্রণয়িনী বসুন্ধরার!
আমাদের কংক্রীটের হৃৎপিণ্ডে তুমি বাজ্‌ছ।

তুমি প্রাথমিক আয়না।
মুখচ্ছবি দিয়েছিলে।
মৃত্যু স্পর্শনীয় হল
(হয়ত অরণ্য হেসেছিল আমাদের মূর্খতায়—
কোথায় গেল চতুর খরগোশ?)—

আজ
সহজভাবে বলতে পারি, 'জল!
তুমি আমারই শঙ্খনাদে, কালবোধের
আঁধার জট থেকে এক শুক্লা তৃতীয়ায়
উজ্জীবনে ফিরেছিলে...'
ভাষার জলপাত্রে, নিজেরই তাণ্ডবের
মরমে রুপোলী মাছ হয়ে থাকার
কবেকার প্রসঙ্গ এসব—
জেলেবস্তীর বারোমাস,
তোমার সাথে আমাদের ভালোবাসা ও কলহের মাঙ্গলিক।

জলাধার!
পাখি ও হাওয়ার পথে জলের শহুরে ঘর।
ঘরে জলের পদশব্দ— প্রাচীন, উচ্ছল!

মানুষের নিজস্ব আছে একটি মাধ্যাকর্ষণ।
জল!
তোমাকে সে নিজের কাঁধের আকাশে ওঠাল।
ভিস্তিওয়ালা! ভিস্তিওয়ালা!
পিঠে টইটুম্বুর মশক!

বাঁশিগুলো ছড়িয়ে দিল সে শহরের মাটির নিচে নিচে।

....

সকাল হয়।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপচে পড়ে নদীদের আহ্লাদী দুপুর—
ঘরে আনতে মাথা ফাটে মায়ের, ছোটো বোনের...। ভিস্তিওয়ালার
ফুসফুসে কেন বালি, মরুভূমির?

জলাধার!
পাখি ও হাওয়ার পথে জলের শহুরে ঘর।
ঘরে বেদনার ডানার শব্দ— প্রাচীন, ভারী!

জল!
কবে প্রথম চেতনায় ভাসল মরামাছ?
কবে চড়া হলাম?
কবে তুমি হলে হিংসা?
কবে ইশ্‌তাহার?

....

....

নীল আকাশের বুকে জলাধার—
রাস্তা থেকে একটু দূরে, কলোনীতে
কারো ভেজা কাঠের গেটের ঠিকানা!
হেলিকপ্টার থেকে নিচে, ক্যামেরায়
শহরের ভাঁজে জলাধার, গায়ে শ্যাওলা এবারের বৃষ্টির;
গোলাপী নারকোলকুচি ফুল
সিঁড়িটাকে জড়িয়ে ধরেছে;
খুব কাছের ছবিতে আমার শতাব্দীর
করুণার মত এক ষোড়শীর
চঞ্চল দুটো চোখ...

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মননের আলোড়ন, প্রহেলিকা সপ্তসাগরের।
নতুন শৃঙ্খল, ঘষটানিতে কাঁপায় পৃথিবীর
পুরোনো জখম ভরা চামড়া। এ উপমহাদ্বীপ
হয়ে সময়ের স্বদেশ, ওঠে সত্বর। তুমি বোঝো
কাজ অনেক, করা হয়ত হবে না, কোনো উচ্ছ্বাসে
না গিয়ে গড়ে তোলো প্রজন্মের আয়ুধ—বর্ণমালা
পাঠ্যক্রম, সহজ বিজ্ঞান, উপযোগী দায়বোধ।

আবেগ দৃঢ় এত, যাকে ভালোবাসো তার প্রশান্ত
কঠোর হও অভিভাবক। যা ঘৃণ্য তার জবাব
দাও মেপে। ইস্পাত চেন এত যে মানুষের হাতে
এবং মাথায় চূড়ান্ত বিশ্বাস তোমার মত কারো
সংযত নীরব দেখি না। দেড়শ বছর পেরুলো
হেডমাস্টার আজো এক তুমিই। মধুকে বাঁচাও,
তা মধুও কবিতার হ্যাপা থেকে বাঁচায় তোমাকে।

কখনো গভীরতর তন্দ্রা হয়ে ডাকে জাগরণ!

জলের নিবিষ্ট যত সমবায়, স্বভাবে ও শ্রমে
জ্যামিতি হারিয়ে পায় অস্তগামী সূর্যের তোরণ
তারপর সারারাত পার্বণের কোলাহল নামে।

ক্ষয়দীর্ণ গাঁ-শহর তোলপাড় ঘাটের সিঁড়িতে,
নামে অন্নফল খরিফের এবং ভেঙে অন্তঃপুর
শীতগন্ধী নারীদের যৌথ মাঙ্গলিক (যেন ঠোনা
পুরুষেরই সত্যে তাকে নির্বিকল্প করে দর্পে চুর...)

ঘুমের ভিতরে কোনো স্বপ্ন আরো অনেক স্বপ্নের
স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে জাগে; ঘরের ছেলেরা ক্লান্তিহীন
কাজ করে, পথ ধোয়, সম্বিৎ পবিত্র করে রাখে...

শেষরাতে আলোর বীথিকা হয়ে যেন জন্মঋণ
হাঁটায় শৈশব থেকে, দেখায় ভোরের শ্রুতিপথে
দীপগুচ্ছ ভাসে, দোলে দূর অব্দি রাতের নদীতে।

মাল্লা

ফিরে আসতে চাই বলে ভালোবাসি যেতে
ভরদুপুরে কান্ডলার নুনের হাওয়ায়
খনিপথে এক হাজার সাইকেলারোহীর
সোনামাখা ব্যস্ততায় ধাবিত প্রত্যুষে।

চুটিয়ে ক'দিন লিখতে তীব্র ইনল্যান্ড
পকেটে পয়সা থাকলে এস টি ডি বুথের
নিরালায় ডাকিয়ে এনে প্রতিবেশী ঘরে
গাঢ় করতে রাত বহু ভাষার জাংশনে।

আমাদের বাঁচাটাই যে হয় না, পৃথিবীর
দশ জেটিতে মাল্লার ধ্যাঁতানি না খেলে।...

সিঁড়ির মুখে কাদাজল, কাঁধে ব্যস্ত রাত;
কড়া নাড়ছি বহুক্ষণ, হয়তো শোনোনি।
যেতে চাই ফিরে আসতে জলের দোটানায়—
কি করব? মাল্লা বলে, 'স্যাঙাৎ! কদ্দূর?'

ঠেলায় চড়ানো বাগান

কোন রোদ জলে ছেড়ে আসা ঋণ?

অকেজো বাল্টি, জংধরা টিন,
পিছনের পোড়ো জমিটা থেকে
খুঁড়ে আনা মাটি; বীজ ও কলম
চেয়ে নেওয়া; সার আবর্জনার...
মায়ের সকাল সাঁঝের নিয়ম।

স্টিমার-ঘাটার লোহার শিকল,
ভাষা ও মানুষ, বিস্মৃতির ঢল,
ভাঙাদেশ, শ্রেণী, আরো শ্রেণীভাগ,
শহর, প্রদেশ, অন্নের দাগ,
এপাড়া ওপাড়া, খুপী, চিলেকোঠা
ছানা-পোনাদের বড় হয়ে ওঠা...

কোন সুখবর সুবাতাস হয়
বাসা বদলের তুলসী, জবায়?

চন্দ্রমৌলি উপাধ্যায়

বাজার পাড়ায় ঘোরানো সিঁড়ি
লোহার—খুবই পুরোনো লোহার।
ছড়ানো অভাব, চিলতে কোঠায়,
বাকি ছাতটুকু ধুলোর দুপুর।
কবিতার খাতা, রূপসী নারী—
পালিয়ে আসা রাজকুমারী।
কালীভক্তি ও জ্যোতিষশাস্ত্র
নিঃসন্তানে, নির্জনতায়।
ঘৃণার মুখোশে বেহদিশ প্রেম
একে অন্যকে দংশানো, শোক...

আর কি বা আছে উপাদান, কিসে
বুঝব যুগল আত্মহনন?
পৃথিবীর স্তরে শহর নিজের
লুকিয়ে নিয়েছে পাণ্ডুলিপি!

হাসপাতালের মধ্যযামে 'ছলাৎ' ওঠে চেনা সে ডাক
ওয়ার্ডগুলির নিথর আলোয় ঝিম দিয়ে যায়।
রাত পোড়ানো কাঁধের পাথর নিবিড় খোঁজে— বড় রাস্তায়
চায়ের সুবাসে এলাচ, দাদুর নাতিটি ছড়ায়।

মাঝ-ডহরে নামে অজানা, মহাজাগতিক।
যেন বা জাহাজ!— নোঙর ঘেঁষে
দুলি আমরা—
রুগীর সাথী নানান মানুষ—
ঈষৎ ভাঙি, কথার ঢেউয়ে!
লেনদেন হয় সালতামামি
হারিয়ে যাওয়ার দরজাগুলির
গ্রাম শহরের ওলটপালট সময় ছুঁয়ে...।

এ মজলিশেই মাঝি টের পায় নিয়মমাফিক
এক পৃথিবী ভালোবাসার
কর্জ উশুল করার তাগিদ—
চায়ে ডোবানো বিস্কুটটায় বুকের বদর;
আঙুল ভিজলে টনক নড়ে
ফস্কে না যায় বাঁচাটা, তার
কানা ভাঙা, আঁশটে বাসি গ্লাসের ভিতর।

সুপ্রভাত, দেশ

সমৃদ্ধি এসেছে, ডালে দোল খাচ্ছে ভাড়াটে খুনেরা।
হিংসক চাহনি ধুয়ে, নেমেছে মদির সৌম্য ঢল;
রোদ্দুরে ঝিলিক দিচ্ছে কার্বাইন, ইস্পাতশীতল,
প্রহরীর কাঁধে;
এখন রাতের অন্ন নিরামিষ
বউ নয়, বেশ্যা নয়, বাবুর্চিরা রাঁধে;
যকৃতের ব্যথা বলে স্থিতি, জল, গগন, সমীরা
পঞ্চমে পাবক সত্য।
আর সব বাঁচার জঞ্জাল—
হদ্দ চেনা পাড়াটায় নতুন চাতাল,
ভীড়ে অচেনা ওস্তাদ,
বেটাইমের হীরু ডাকাত, ঘোলাজলে
বিলোচ্ছে পুঁটি, ধরতে রুই, পাট্টাদারী জবর-দখলে—
যদিও এত চট করে প্রমাদ
গুনবেনা মূল বন্দোবস্তক'টি,
শাসনে ছিলেন ভালো
এখন যে নেই তাও বেশ পান রুচিস্নিগ্ধ আলো—
ডালরুটি,
বুদ্ধিবলে সৈন্যদল বেচে—
যখন যেদিকে দর ভারী;
আছে ঠিকাদারী
ধার্য দেয় রাজকার্য ছেঁচে।

এলাকায় মাটি আছে, নেমেছে শিকড়
বেওয়ারিশ স্বপ্ন আছে ঘরে ঘরে, পোষক নির্ভর
এবং পাবক সত্য; নিরভ্র টাটা সুমো থামে
কবেকার রামজীওয়া, সার্বভৌম বটবৃক্ষ নামে।

মা ও ছেলে

রোজ দেখি।
গলির দেয়ালের নিচে গোবর মাখছেন
খড়কুট্টি মিশিয়ে
অথবা ঘুঁটে দিচ্ছেন দেয়ালে...
খেয়াল করিনি যে তিনি মা।
বয়স আর কাজের ভারে শরীর
কোমর থেকে সমকোণে— সকাল, দুপুর, বিকেল;
তাঁকে বরং গলির ইতিহাস ভেবে এসেছি এতদিন।

আজ তাঁর ছেলেকে দেখলাম।
পেপারওলা লোকটি পিছন থেকে সাইকেলের
ব্রেক চেপে ডেকে উঠল 'মা...!'
মা 'বেটা' বলে সাড়া দিয়ে
থপ্ করে বসে পড়লেন—
পাথরটা চাপ খেয়ে ছলকে দিল কাদাজল...

না বসলে তাকাবেন কি করে?
উঁচুতে?
ছেলের দিকে?
কোমর যে ভাঙা!

গোবর লেপটান দু'হাত নেড়ে নেড়ে
ছেলের সাথে কথা কইলেন
কিছুক্ষণ।

আমি মা ও ছেলেকে দেখলাম।

অভ্যাস

গাছের পিছনে বাড়িটায়
রোদ্দুর পড়েছে গাছের চেয়ে বেশী।
বাড়ির ভিতরে মুখ—
আদ্ধেক জানালা,
আদ্ধেক গাছ।

দেশ নয়
শহর নয়
শুধু কয়েকটি পথ আমরা বাঁচি
আজীবন।
ঘুরে ফিরে সেই কয়েকটি পথ
যা এক জীবনে কুলোয়।

পরিচিত ঠেকগুলির সাথে
বয়স বাড়ে
কোণঠাসা হই।

দরজা খুললে পা থেকে মাথা অব্দি দাঁড়ায়
নতুন কণ্ঠস্বর।

সমুদ্র দুইভাবে ডাকে।
দুইভাবে সাড়া দেওয়া
আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

এ বাঁধন

এ বাঁধন অন্য কারো নয়, তোমারি নিজের।
যদি মনে করো আমায় ভালোবাসো
বেঁধে দেব,
নিজের বাঁধন খুলে,
বাঁধিয়ে নেব তোমার আঙুলে।
খোলার ঐ নিমেষটুকুতে
একটু বাউন্ডুলে হব
একটু ভিখিরি হব
জলকুম্ভী ঠেলে সরিয়ে দু'হাতে
কালো জলে ধরব দুটো চিলের ছায়ায়
মৃত্যু দু'জনের।
এ বাঁধন অন্য কারো নয়...

চিঠি লেখা

দু'পৃষ্ঠা ভরে চিঠি লেখা,
শেষ করেও শেষটুকু না লিখে
উনিশরাত পর আবার
এখুনি ফুরোনো স্মরণীয় দিনটার কথা লেখা...

কিছু ঠিকানা
আপন করে রাখা;
স্বদেশের, পৃথিবীর।
মাটিতে কান পেতে
কয়েক শো আকাশ দূরের
কোনো গলিতে
ডাকপিওনের সাইকেল শোনা রুদ্ধশ্বাসে
চৈতন্যে তোলা সেখানকার
ব্যস্ত হাওয়ায় মোচড়।

এ একটা ভিন্ন যুগের পদচারণ, বন্ধু!
আমাদের শরীরে।
গালিবের বাতিদান, কোপারনিকাসের ডাইরি
অতৃপ্ত হড়প্পা
বিদ্রোহিনী নারীর দহন
যা আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি, রাখব—

দিনকে দিনই বলব,
রাতকে রাত,
তবু আমাদের
নিগূঢ় সমাচারের না-দিন—না-রাত
কখনো শান্ত হবে না

আকাশ সন্ধানে
ওড়াবো নিত্যলিখনের পাঁচমিশেলি পাখি—
দিনযাপনের কোলাজ,
কবিতার জেরক্স,
কাটিং খবর কাগজের,
কলের জল চলে যাওয়ার চিন্তা থাকবে প্যারাশেষে।

কাল সকালে

কাল সকালে কুয়াশা থাকবে খুব।
দুধ আনতে গিয়ে দেখব
প্যাকেটগুলো ধোঁয়াটে হয়ে আছে।
একটা গন্ধ উঠবে গেট, রেলিং, সাইকেল
ও যাবতীয় লোহার জিনিসগুলো থেকে।
রোদ দেখা দিতে অনেক দেরী থাকবে তখনও।
আমার ইচ্ছে হবে কোনো জলাশয়ের ধারে যাই।

আমার ইচ্ছে হবে আমার কোনো বন্ধুও
সেই জলাশয়ের ধারে আসুক।
সে বলুক, সে এক্ষুনি আবার ফিরছে একটা কাজ সেরে
আর সে যতক্ষণে আসবে
ততক্ষণে
দুটো পাখিও এসে বসবে সেই জলাশয়ের ধারে।

স্বাভাবিকভাবেই আমার জানতে ইচ্ছে হবে
কি বলছে পাখিদুটো নিজেদের ভাষায়
নিজেদের প্রাত্যহিক ব্যস্ততায়...
কিন্তু আমি পক্ষীবিশারদ নই।

বস্তুত আমার বন্ধুরা আমার সবচেয়ে প্রিয় ও পরিচিত পাখির দল,
তাদের খাঁচা ও আকাশ দুই-ই আরো অনেক বন্ধুদের
ডানা দিয়ে গড়া— তাদেরও খাঁচা ও আকাশ...
এবং এভাবে আমি প্রয়োজনীয় খড়ের কাছে পৌঁছোই।

খড়ের ওম্ পাই স্বপ্নে সারারাত—
চাঁদ গলা বাড়িয়ে টান দেয় তাতে;
আমি বলি 'হুস! হুস! এখন সময় নয়।'
ডানার ঝাপটে তাকে তাড়াই।
আমার ডানা— আমার বন্ধুদের খাঁচা ও আকাশ।

কাল সকালে কুয়াশা থাকবে খুব।
জলাশয়ের ধারে
বন্ধুর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় আমি থাকব।
এক্ষুনি ফিরে আসার নামে তো রোজই যাই
আমরা, একে অন্যের কাছ থেকে...
প্রতীক্ষার এই পরিভাষাটা থাকে না।

শিশুরা স্কুল থেকে ফেরার পথে বড় হয়...

দিনের রঙটা বদলায়।
গলির পর গলিতে ভাষার
ছাই থিতোয়, কিছু এখানের কিছু
অন্য অঞ্চলের বন্ধ চিমনির।

চোখের সাদা
বাড়ে রোয়াকে, দোকানে—
নালার ওপর
গুমটির জায়গাটুকু নিয়ে
দু-ফাঁক হয় মাথা।
পাড়ার ভিতরে গড়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খী পাড়া—
দোতলায় ব্যাবিলন।
কালো কাঁচ লাগিয়ে আসে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের
দ্বিতীয় গাড়িটা।
থানার মোবাইল
এসে পিটিয়ে লাশ করে নিরপরাধ
ঈষৎ ফচকে ছেলেটিকে।
বাজারের রমরমায় চলতে থাকে উত্তেজক প্রচার
নানাবিধ উত্থানের !...

কিছু একটা করতে পারার কথা ছিল !...একদিন
শোষিতের ঐক্যভাঙা দালালরা নিপাত যাক !...তবু একদিন
বস্তুত ইতিহাসের নিয়মে ভবিষ্যৎ আমাদেরই !...তবু

একদিন
অন্যায় মিছিল করে পথে।
মূঢ়তা আগুন জ্বালে যৌবনের শিরায়।
বিচ্যুতি জাগিয়ে তোলে বিবেকের মোচড়।
মিথ্যা ঝরায় অশ্রু, সমবেদনার।
অমানবিকতা
নিজের 'শহীদ'দের রক্তে মাটি ভেজায়।
ক্রুর ভাঁড় হতে চাওয়া—
হয় একটা জঙ্গী আন্দোলন।

শিশুরা
স্কুল থেকে ফেরার পথে বড় হয়...।

গীটার-শিক্ষককে

একটা কিছু তো বাজাও—
যাতে গীটারটা খুঁজে নেয়
এদেশের হাওয়াই কিম্বা স্পেন!

পার্টটাইম চাকরী
ছোটভাইয়ের এমন অসুখ যা এদেশে
বড়লোক ছাড়া হওয়া বারণ।
নিজে ভোঁতা হয়ে চলেছ শরীরে এবং
নিঃসঙ্গতায়...
হাত
তবু ফুসফুসের মত গরমভাবে ধরে
প্লেক্ট্রাম বা স্টীল।
প্রাইভেট কোম্পানির কাজের
ছোট ছোট দৈনন্দিন অপমানের ফাঁকে
চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে নতুন
ইমপ্রোভাইজেশন;
হবে, তোমারও হবে...
কিন্তু গীটারটার?
এতে হবে না।
এতে কিছু হবে না।

তাঁদের কথা বাদ দাও
গীটারকে রবীন্দ্র-নজরুলের গায়কী যাঁরা করেছেন
ভীমপলাশি কিম্বা মাড়োয়ার
খিলানে ধরেছেন রোদ্দুর
হাসিকান্নায়
ভরিয়েছেন সেলুলয়েডে পঞ্চাশের জ্যোৎস্না।

গীটার ভাঙছে।

ভাঙন রোধ করা একা তোমার কাজ নয়...
জানি
কিন্তু তাই তো গীটার!

জুন-দুপুরের ম্যান্ডোলিন

মা বলেছিলেন
'তোরা আরেকটাকে কবে আনবি পৃথিবীতে?
আন!
দিয়ে যাস! ওটাকেও মানুষ করে তবে
যাব, যেখানে যাওয়ার।'

মায়ের কোল থেকে মায়েরা
জন্ম নেয়। শহরের এই নোংরা কাদাগলি
শক্তির উপত্যকা হয় কবির—
চাকা, তরোয়াল ও শোক—
আঙুর গাঢ় হয়
প্রবল মাতৃত্বে, বসুন্ধরার,
প্রবাদে বাঁধা পড়ে ঋতু,
জানালায় মাটির কলসে
থাকে জুন-দুপুরের ম্যান্ডোলিন।

বাইরে ঘাম,
কার্বন ঝরায়
অনেক গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে কাজে লাগা
লিথোর বলগুলো,
রাতের গুমোটে
আমাদের ভাষার পতন, গানের অর্থ চুরি যাওয়া...

একটি দুধের চারা
নীরবে শিকড় ডোবায়, অরাজক
দুরূহ প্রত্যুষে।
অতসী বড় হবে।
....

কত বড় ছিলাম আমি, কত ছোট ছিল
বছর পনের ষোল আগে পৃথিবী।
সুদূর গ্রহের মত ছিল;
তার মাধ্যাকর্ষণ

পায়ে বোঝার মত ছিল।

মাধ্যাকর্ষণ আমার ডানা আজ।
আজ থেকে বছর পনের ষোল পরে
আরো অনেক ছোট হব আমি
পৃথিবী আরো অনেক বড় হবে।
তবু সে অনেক দিন!
শহর মূর্খতর হবে রোজ,
গ্রামের নেড়া ঘাড় হিংস্রতর হবে,
গঞ্জে বেরোবে স্থানীয় সাপ্তাহিক
গণধর্ষণের ক্ষতগুলো সারিয়ে উঠে বারবার।
মানচিত্রে বিদীর্ণ হবে হাত,
পতাকায় ছায়া ফেলবে শাসকের জ্বালানো আগুন।
অতসী আঁকবে মুখ 'রাতের প্রহরায়'
বার্ণ্ট্ আম্বারে, হলুদে, ক্রিমসনে্
দাঙ্গার রাতে দেয়ালের মত দাঁড়ানো
গলির মোড়ে তার সাথীদের।

....

পুরোনো ট্রেডল মেশিনের সাথে
রাত জেগে ফিরি—
এনিবেসেন্ট রোডের মোড়ে অন্ধকার,
মাঝপথে মন্দিরের মাথায় আকাশ মেলে থাকা
অশত্থের পাতায় কান পেতে শুনি,
নীলচে হাওয়ার জোয়ার
উঠবার সময় হল কিনা।

আমি কি ক্ষয় করছি নিজেকে?
নাকি জয়?
প্রতিদিন?
বারবার প্রুফ পড়েও থেকে যাওয়া ভুলগুলো
শোধরাচ্ছি, বৃষ্টি ভেজা প্রেসের উঠোনের দিকে তাকিয়ে?

গেয়ে চলুন গিরিজাদেবী

(পাটনার শারদীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান ঃ একটি স্মৃতিচারণ)

চারটে ছাতার নিচে
গায়িকা ও যন্ত্রী তিনজন!
নবমীর ভোর থেকে বৃষ্টি, ফলে রাতের পার্বণ
ভাঙা হাট;
মঞ্চ ঘেঁষে শতেক
শ্রোতা তলানির
ভিজছি এবং দেখছি সাফল্য আমাদের দাবীর
যে সকলে একজোট বলায়,
'বৃষ্টি পড়ছে পড়ুক
গেয়ে চলুন!'
তিনি গাইছেন—
নথে হীরের কৌতুক—
গেয়েই চলেছেন পরিচিত সুতীক্ষ্ণ গলায়
তাঁর নতিস্বীকার, তাঁর আনন্দ, তাঁর গৌরবের দায়...।

গেয়ে চলুন গিরিজাদেবী!
টপ্পা নানা প্রদেশের, তিন শতাব্দীর তরাণা
ঠুমরির বোলবদল, কাজরি, হোরি, চৈতির আঙিনা...

আমাদের তর্ক আমরা থামাবো না কিছুতেই।
আমরা একশবার
'শ্রেণীভিত্তি', 'শোষক প্রকৃতি'
খুঁজব ওই গানের, নতুন
গানও বাঁধব অবশ্যই।
তবু জাগব রাত
গরম রেখে বিড়ির বেসাতি
প্রতি দশেরায়।
আপনি গাইবেন, আমরা গাওয়াব...
কালচে বাসি চা গিলে জলকাদায়
বসে শুনব।

কড়া নাড়ব?

শেষ রাতে শহরে নেমে
এ রাস্তা ও রাস্তা
এ গলি সে গলির পর

এই তো, উনত্রিশ নম্বর!
চিঠিতে লিখেছিল
এটার ভাড়া সমান, কিন্তু
ঘরদুটো ছোটো অনেক।
দরজা বন্ধ, ভিতরে অন্ধকার, আওয়াজ
একটা পুরোনো টেবিলফ্যানের;

বন্ধু ঘুমোচ্ছে—
ঘুমোচ্ছে তো?

তার স্ত্রী?
(কি যেন নাম সে নারীর!)
ছেলেমেয়েরা?

কড়া নাড়ব ?
না। একটু পর।
আগে মন ভরে দেখে নিই
এত দূরের এই পড়োশী ভাষার শহরে
লড়াইয়ের তাত্‌টা জিইয়ে রাখা সাথীদের হদিশ,
আমার বন্ধুর ঘর।

কড়া নাড়ব?
না। আরেকটু পর।
যাই, গিয়ে দেখি মোড়ের চায়ের দোকানে
উনুন ধরিয়েছে কিনা।

এই তো

এই তো মাটি যার ওপর আমি দাঁড়িয়ে!
পৃথিবী বলো বা দেশ
জন্মের শহর
বা বেরোবার আগে তোমায় দেখবার নিমেষ;
কে ভেঙে দেবে?

ওই তো মেঘ যার ছায়া আমার মুখের ওপর!
জীবন বলো বা দুঃখ
আলোড়িত গান
বা ফিরে আসার সামুদ্রিক দিগ্বলয়;
কে শুষে নেবে?

রাতে চোখের পাতা কাঁপে ঘুমন্ত শিশুটির—
স্বপ্ন দেখে সে।
তার বয়স দু'দিন, তার স্বপ্নের বয়স একদিন
তার কান্নার, দু'দিন
তার হাসির, একদিন,
সেই একটি দিনের দিনমান
আমাদের হতে হবে।

নাম পৃথিবী

পাহাড়ের কোলে মেঘ নামে।
মানুষ
মুড়ি আর জল খেয়ে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করে।
এই গ্রহটার নাম পৃথিবী।
এক ঝলক রোদ্দুরে জন্ম সারা হয়।

●

টাটের পিছনে নারী তোমার ভয়কে খান্ খান্ করে
আর্ত গর্জনে।
কালোচুলো একটা ছোটো দস্যি ছুঁড়ে দেয়।
'তুমি বহুবার এই জায়গায় এসেছ,
চিনতে পারছ না?' দস্যি বলে।
'আশ্চর্য!'—
বড় বড় ঘাসের ঢেউ সায় দেয়।
ভালোবাসার অগাধে কাঁপে তোমার সজল আসা ও যাওয়া।

●

পাহাড়ের কোলে মেঘ নামে।
ট্রেনের ভাঙা দরজায় লাল পতাকা ফেঁসে যায়।
যত্নের সাথে ছাড়াই।

বিড়ির ছাই ফেলবার জায়গা পাই না।
সামনের স্টেশনে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয় জি. আর. পি।
গ্রহটার নাম পৃথিবী।
এখানে আমরা
শান্তি,
স্বাধীনতা আর বিপ্লবের জন্য লড়ি।

বিহার

বিহার! তুমি ডাকো বাদলা শেষরাতের আকাশে
নিজের নাম ধরে, লণ্ঠনটা একটু উঁচু করে
বিদ্যুৎচমকে চেন, পৃথিবীর
বন্দরগুলি পেরিয়ে এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার
ফিরে তাকানো মুখ

তুমি বও ভারতবর্ষে তোমার ঐশ্বর্যের
উদভ্রান্তি, পাহাড়ের ক্ষয়, সমতলের
বারুদগন্ধী অপচয়
কাঁপো কচি অশ্বত্থ হয়ে তোমার প্রশ্নাকীর্ণ বাতাসে
গাও দেশের...
বস্তুত এ পুরোদেশটারই—
গভীরতর কাঁচা জখম
গঙ্গা গন্ডক শোণ কোশি সুবর্ণরেখার ভাষায়...

খৈনিটা ডলো ভাই
একটু আমার জন্যও ;
এ স্টেশনে প্রতিবার এমনই অকারণে
দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন।

রাত্রে ভাতের দোকান

হাত ধুয়ে বসি বেঞ্চে, পথে দু'পা টানটান দুদিকে ছড়িয়ে।
খিদে বাড়ে, সোনামুখী আঁচ ঘিরে গ্রাহকের নিরুদ্বেগ তাড়া—
ভাতের ডেকচি থেকে ধোঁয়া-ভাত, ডাল, সব্জী, ভাজা, একমাপ
সকলের জন্য আসে, আমার জন্যও একফাঁকে,
তেড়ে খাই
দোকানির ছোট্ট মেয়ে ঘুম চোখে জলের গেলাস রেখে যায়,
উচ্চিংড়ে তাড়াই, ঝাল-ভাজা কিছু শেষপাতে খাবো বলে রাখি,
কাঁচালঙ্কা ডলে চাই একটু পেঁয়াজ।

খাওয়া শেষ হলে বসে
নিখাদ দিনযাপন পুরোনো বা নব্য বসতের, মজে শুনি—
গুঞ্জন ও মৌন যার খেই ওঠে শূন্য পথে আলো-পোকা ঘিরে,
ভেসে যায়, নিমের ডালপালায় লাগে হাওয়া— কিছু বলে নাকি?
সিগ্রেট ধরিয়ে দেখি দোকানির বড় মেয়ে ব'সে পরীক্ষার
পড়া তৈরি করে, তার জননী রুটি বানায়, কাজের ছেলেটি
বসে ধোয় এঁটো বাসনের ডাঁই...
কোথাও ঘুমোবো, তার আগে
নির্জন পথের ধারে পা ছড়িয়ে বেঞ্চে বসে ভালো লাগে খুব।

কোনোদিন ভাত না খেয়ে রুটি খেলে একটু জরুরী হয় চা।
'এখন হবে না...' শুনে দোকানিকে পীড়াপিড়ি করি যাতে দয়া হয়,
এবং তা হয়ও যদি পুরোনো গ্রাহক হও তুমি,
আর যদি
থাকে বন্ধুরা, তোলে আওয়াজ— 'জয় হোক, প্রভুজীর জয় হোক!'

স্তিমিত উজ্জ্বল মেঘ, নক্ষত্র মাস্তুলে মেখে নিমডালে নামে,
বেঞ্চে ব'সে অদীক্ষিত অসমাপ্ত সফর পোহাই নিজেদের।

গম্বুজ

ফৈজাবাদ স্টেশনে ছিল হাজার
পাটনায় নেমে শয়েক
এলাকায় ডজন
গলির মোড়ে একা
ওই যে ওই লোকটা!
তবে এবারে আর ভুখা মিছিল করে নয়
একটা মসজিদ ভেঙে ফিরছে।

চারদিকে কারফিউগ্রস্ত শহর।
লোকটার জ্বালানো আগুন
তাবৎ দুনিয়ায়
কোথায় কোথায় যেন জ্বলছে...।

শীতে কাঁপছে পেটের ক্ষিধের দলা,
চোখে লাল সাতদিনের 'জয় শ্রীরাম...'
আর পকেটে হিন্দুত্বের মহাপ্রসাদ—
নোনাধরা পাটকেল।

কম কথা নাকি?
পয়ঁতাল্লিশটা বছর যে স্বাধীনতা, মানে হামবড়া
ইতিহাস... মানে আক্কেলগুড়ুম
সম্প্রীতি... মানে শেঠ, পুলিশ, হাকিমের সখী-সখী ভাব
আর ছড়িটা ওর মাথায় বোলানো—
তার কটা গম্বুজ
ও নিজের হাতে টুকরো করেছে।

কোথায়?
ভারতবর্ষকে টুকরো করার আবহমান দালালেরা!
ওকে বাহবা দাও শিগগির!

তবে, একটু সাবধানে কাছে যেও ওর।